দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

সবকিছু পরিবর্তন হলে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নয় কেন?

প্রকাশ : ২২ মার্চ ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. শরীফ এনামুল কবির

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন থেকে যায়। সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিত, বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক প্রবণতা প্রভৃতি ইস্যু শিক্ষার সার্বিক মানের আলোচনায় রসদ জোগায়। বিশ্ববিদ্যালয় দেখভালের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদনেও এসব বিষয় উঠে এসেছে। প্রতিবেদন থেকে এটা প্রতীয়মান যে বর্তমানে বেশিরভাগ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনেরও। বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজ। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে সবকিছু। সংবিধানসহ আইনের নানা ধারা-উপধারারও পরিবর্তন করা হচ্ছে প্রয়োজনের আলোকে। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রবর্তিত হওয়ার পর গত হয়েছে চার দশক। দীর্ঘ এই সময়ে একবারও সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়নি এ অধ্যাদেশ। তাই বলে এটি কখনো সংশোধন করা যাবে না, বিষয়টি এমনও নয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, গবেষণার মান বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বাড়ানোসহ শিক্ষা ও গবেষণার মান নিশ্চিতকরণে নতুন কিছু ধারা সংযোজন করা যেতেই পারে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও অভিন্ন নীতির আওতায় আসতে পারে।

ক্লাস-পরীক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিধান, বছরে ন্যূনতম গবেষণা-প্রকাশনা, গবেষণার আবশ্যিক বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। সেন্টার অব এক্সিলেন্স নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক গবেষণাগার নির্মাণ ও গবেষণার সর্বোচ্চ পরিবেশ তৈরিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্যে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিশেষ গবেষণার জন্যে বিশেষ বোনাসের বিধানও করা যেতে পারে। সার্বিকভাবে সংশোধনের লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা, তবে মনে হয় সম্মানিত শিক্ষকগণসহ কোনো পক্ষই এ ক্ষেত্রে আপত্তি করবেন না।

অধ্যাদেশের অপব্যাখ্যা দিয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে তো নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই।' এমন শিক্ষকও খুঁজে পাওয়া যায়, যিনি তাঁর বিভাগীয় পাঠদানের অংশ হিসেবে প্রতিবছর একটিমাত্র কোর্স নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক বছর পর শুরু করেন। একটি বিষয়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে প্রায় এক বছর সময় নিয়েছেন, এমন শিক্ষকও আছেন। কিন্তু অধ্যাদেশের দুর্বলতার কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ারও সুযোগ থাকে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

সম্মানিত শিক্ষকদের একটি অংশ কেবল সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সন্ধান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নীতিমালার পাশাপাশি জ্ঞান-অন্বেষণ, জ্ঞান বিতরণ ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি গবেষক হয়ে উঠার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতেও উৎসাহিত করা হয়েছে। ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষা-গবেষণা ও জ্ঞানের নতুন দ্বার উন্মোচন প্রভৃতি ইস্যুতে নিজেদের ইচ্ছেমতো চলা, পছন্দমতো পক্ষে যুক্তি বের করে দায়িত্বপালনে গাফিলতি কি অধ্যাদেশের মূল স্পিরিটের বিরোধিতা নয়? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপ্রদানের এই দায়িত্বটুকুর ক্ষেত্রে মনে হয় আপস করা ঠিক হবে না।

দেশে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংকুলান হয় না। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিচ্ছে। উন্নত বিশ্বে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিপুল পরিমাণ টিউশন ফি দিয়ে প্রতিবছর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, অকল্যান্ড, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এ সম্ভাবনাটা প্রবল। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ প্রভৃতি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই এসব নিয়মের তোয়াক্কা করছে না। গুণগত মানের পরিবর্তে নির্ধারিত সময় শেষে একটি সার্টিফিকেট তুলে দেওয়াই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ইউজিসি তাদের প্রতিবেদনে উদ্বেগের সঙ্গে জানিয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পর্যায়ে ৬৮টি পদই খালি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এসব পদ খালি থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির মতো বাধ্যতামূলক সভা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে ব্যাহত হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। ইউজিসির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে লিখিতভাবে তাগিদ দেওয়া হলেও কাজ হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তি এসেছে মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যানের মুখ থেকেও। উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে খোদ ইউজিসিরই মন্তব্য, 'দেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বিশেষ করে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটছে, তবু শিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।' এমন মন্তব্য করেই কি দায় এড়াতে পারে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানটি? বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পৃথক বিধিমালার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আছে জনবলের ব্যাপক ঘাটতিও। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে প্রায় সোয়া শ'। অপ্রতুল জনশক্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সরকারের সমন্বয় করার জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না ইউজিসি। আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক প্রভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থাগ্রহণের এখতিয়ার ইউজিসির হাতে নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠালেও অনেক সুপারিশ মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকে ফাইলবন্দি অবস্থায়। এছাড়া মন্ত্রণালয় সেই সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে, না-ও পারে। এ ছাড়া স্বায়ত্তশাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক যাচ্ছেতাই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় গড়া। মেধাভিত্তিক জাতিগঠনে বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। মূলত এ লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর একটি খসড়াও ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে র‍্যাংকিং এর আওতায় আনা যাবে। এতে শীর্ষে থাকার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। বিশ্বের অন্যান্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। এ কমিশন গঠন করতে পারলে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যথেচ্ছ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, উচ্চশিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণ সম্ভব হবে।

উচ্চশিক্ষা কমিশন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ক্যাম্পাস, শিক্ষা কার্যক্রম, সংরক্ষিত তহবিল, সিন্ডিকেটের কর্মপরিধি, নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর যোগ্যতা, টিউশন ফি, অডিট, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, চাকরির প্রবিধানমালা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটি, পাঠ্যক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, নিয়োগ কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ধারণ করবে। অনিয়ম হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যেতে পারবে। প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা উচ্চশিক্ষা কমিশনের সুফল পাচ্ছে। এশিয়ার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতে ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সে তালিকায় স্থান পেয়েছে শ্রীলঙ্কা, এমনকি পাকিস্তানের মতো দেশও। তবে আমরা কেন পিছিয়ে!

বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুসারে সংবিধান পরিবর্তন করা হয়েছে একাধিকবার। প্রয়োজনের আলোকে রচিত হচ্ছে নতুন আইন। বিদ্যমান আইনের সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনও একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু বিপত্তি কেবলই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বেলাতেই? তা কেন হবে। অথচ নিয়ম করেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে অধ্যাদেশের ধারা-উপধারা। বিশ্ব প্রাগ্রসর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যভিত্তিক শিক্ষার ঝোঁক লক্ষণীয়। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে আমরা কতকটা ভুল পথে চলছি বলে মনে হচ্ছে। কেবল তথ্য একটি সমাজকে উন্নয়নের পথে দাঁড় করাতে পারে না। তথ্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণালব্ধ জ্ঞানই শুধু সমাজ, রাষ্ট্রকে দিতে পারে এক আলোকিত বাংলাদেশের ঠিকানা। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষা বা উচ্চতর শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রেখে অ্যাক্ট স্ট্যাটিটিউট বা অন্য যে সকল নীতিমালা, বিধিমালায় পরিবর্তন জরুরি, সে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা জাতীয় স্বার্থেই একান্ত আবশ্যক।

n **লেখক : সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।